গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৫ সংখ্যা | ৯ - ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

নেতাজির চিন্তাই নাকি সংঘের চিন্তা!

চরম মিথ্যাচার বিজেপি-আরএসএসের

নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষে এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যে ভাবে নেতাজি-বন্দনায় মেতে উঠেছিলেন, তা দেখলে হঠাৎ যে-কারও মনে হতে পারে, এঁরা বোধহয় নেতাজির আদর্শের প্রতি একান্ত অনুগত এবং নেতাজির অপূরিত কাজকে সম্পূর্ণ করাই তাঁদের লক্ষ্য।

সত্যিই কি তাই? প্রথমে দেখে নেওয়া যাক তাঁরা কী বলেছেন। ২৩ জানুয়ারি দিল্লিতে সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীর এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর সরকার নেতাজিকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার জন্য সব রকম পদক্ষেপ করেছে। ভাগবত সে দিন কলকাতার এক সভায় বলেছেন, সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্ঘের চিন্তাধারার কোনও পার্থক্য নেই। সঙ্ঘ নেতাজির প্রেরণায় কাজ করছে। তিনি নেতাজির অধরা স্বপ্ন পূরণ করার ডাক দেন। এই দুই নেতার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতটুকু? দেখা যাক ইতিহাস কী বলে।

সাম্প্রদায়িক বিজেপি বনাম অসাম্প্রদায়িক নেতাজি

নেতাজির জীবন ও সংগ্রামের কথা যাঁদের কিছুটাও জানা আছে তাঁদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না যে, প্রধানমন্ত্রী কিংবা ভাগবতের চিন্তাধারার সঙ্গে নেতাজির চিন্তাধারার কোনও মিলই নেই। দুই চিন্তাধারার পার্থক্য বাস্তবে দুস্তর এবং সম্পূর্ণ

সাতের পাতায় দেখুন

না আছে সততা, না ন্যায়বিচার

কেন্দ্রীয় বাজেট

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশে রামরাজ্যের সূচনা হয়েছে। ফলে ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করলেন, আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে তা যতই অন্তর্বর্তী বাজেট হোক, মানুষ আশা করেছিল, নিশ্চয়ই তাতে রামরাজ্যের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। তারা আশা করেছিল, অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সত্য ছবি তুলে ধরবেন এবং বাজেটে 'রামরাজ্যের' প্রজাসাধারণের, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, গরিবিতে বিপর্যস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দুরবস্থা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করবেন। কিন্তু তাঁর বাজেট ভাষণে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনায় না মিলল সততার নিদর্শন, না পাওয়া গেল জনসাধারণের প্রতি ন্যায়বিচারের কোনও পরিচয়। আসন্ন লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে অর্থমন্ত্রীকে কেবল কিছু অলীক স্বপ্নের বুদবুদ ওড়াতে দেখা গেল।

দুয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে জার্মানিতে গণবিক্ষোভ

জার্মানিতে বাড়তে থাকা অতি দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে বার্লিনে রাইখস্ট্যাগ ভবনের সামনে গণবিক্ষোভে সামিল হল ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ। ৩ ফেব্রুয়ারি

বিদ্যুৎ মাশুল ঃ ক্ষুদ্রশিল্প ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া

বিদ্যুতের বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ৩০ জানুয়ারি রাজ্য জুড়ে ক্ষুদ্রশিল্প ধর্মঘট পালিত হল। ক্ষুদ্রশিল্প বিদ্যুৎগ্রাহকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণে এ দিন রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলায় ক্ষুদ্রশিল্প বন্ধ রেখে জেলা শহর সহ বিভিন্ন জায়গায় গ্রাহকদের অবস্থান হয়েছে। পথসভা, বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন, ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী গ্রাহকদের মিছিল হয়েছে। ব্যাপক মিনিমাম চার্জ ও ফিক্সড চার্জের আক্রমণে গ্রাহকদের বিপুল ক্ষতি হওয়ায় তাঁরা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না। ইতিমধ্যে হাজার হাজার গ্রাহক তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এ সব সমস্যার কথা ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। কিছু মৌখিক আশ্বাস ছাড়া এখনও পর্যন্ত এই বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার করা বা স্মার্ট মিটার বাতিল করার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ দিন ধর্মঘটের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের মোট ৫৩টি জায়গাতে অবস্থান, ১৯টি বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন, ৯টি জায়গায় গ্রাহক মিছিল হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ধানকল, গমকল, তেলকল, গ্রিল ফ্যাক্টরি প্রভৃতিতে সফল ধর্মঘট করেন ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকরা। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে দু-সহস্রাধিক ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক শহরে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হন। ফকির কুঁয়ার কাছে বিদ্যুতের জেডএম-আরএম-ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়ে মিছিল করে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখান থেকে মিছিল গান্ধীমূর্তির পাদদেশ ঘুরে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে পৌঁছালে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার মেদিনীপুর শহর কমিটির সম্পাদক প্রাক্তন শিক্ষক সুশান্ত সাহু।

মেদিনীপুর শহরে ডিএম অফিসের সামনে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ সমাবেশ। ৩০ জানুয়ারি

চারের পাতায় দেখুন

১৬ ফেব্রুয়ারি

সারা ভারত শিল্পধর্মঘট ও গ্রামীণ বনধের ডাক

এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট তাদের নির্বাচনী প্রচারেরই মুখবন্ধ। সরকার তাদের তথাকথিত সাফল্যের ঢাক পিটিয়ে আত্মপ্রচারেই ব্যস্ত থেকেছে। সামান্য কিছু জনমোহিনী ঘোষণা এই বাজেটে থাকলেও দরিদ্র শোষিত শ্রমিক কর্মচারী, স্কিম ওয়ার্কার, কৃষক, বেকার যুবকদের শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য সরকার একটা বাক্যও ব্যয় করেনি।

এই অন্তর্বর্তী বাজেটের তীব্র নিন্দা করে এআইইউটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও সংযুক্ত কিসান মোর্চার পক্ষ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি শিল্প ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

একের পাতার পর

অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ জিডিপি ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে অর্থাৎ ৭ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। স্বপ্নের পোলাওয়ে ঘি ঢালতে কার্পণ্য করেননি তিনি। এতদিন প্রধানমন্ত্রী ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের খোয়াব দেখাতেন, অর্থমন্ত্রী এবার একলাফে সেই সীমা পার হয়ে গেলেন। কিন্তু কী ভাবে, কোন হিসাবের ভিত্তিতে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী, তা কিন্তু তিনি ভুলেও খোলসা করেননি। হিসাব বলছে, ২০৩০-এ ৭ লক্ষ কোটি ডলারের জিডিপিতে পৌঁছতে গেলে অর্থনীতির প্রকৃত বৃদ্ধির হার হওয়া প্রয়োজন ৯.৫৫ শতাংশ। অথচ বাস্তবে গত ১০ বছর ধরে অর্থনীতির প্রকৃত বৃদ্ধির গড় হার মাত্র ৬ শতাংশের কাছাকাছি।

দেশের মানুষের আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার বাড়াতে হলে প্রয়োজন জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো। দেশে কায়েম থাকা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মেই আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের কেনার ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে। বেকারত্বের হার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। প্রয়োজন ছিল এই অবস্থার মধ্যেও যতটা পারা যায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের হাতে পণ্য ও পরিষেবা কেনার মতো টাকাপয়সার জোগান দেওয়া। প্রয়োজন ছিল ধনকুবের, পুঁজি মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারি নীতির পরিবর্তে কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সমস্ত নীতিকে ঢেলে সাজানো। কিন্তু এবারের বাজেটে চূড়ান্ত প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলিতে সামান্য গুরুত্বও দিল না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

বাজেট ভাষণের শুরুতে অর্থমন্ত্রী বড় গলা করে বলেছেন, "দেশের মানুষ বর্তমান নিয়ে গর্বিত। তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী।" বাজেটের দিনকয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ভাষণে বলেছেন, গরিব, যুব, অন্নদাতা অর্থাৎ কৃষক ও নারী— এই চার গোষ্ঠীর উপর নজর দিলেই নাকি উন্নত দেশ হয়ে ওঠা আদৌ কঠিন নয়। দেখা যাক কেমন 'বর্তমানে' দিন কাটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখিত দেশের এই চার গোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা ভোগব্যয় নিয়ে সর্বশেষ সমীক্ষা করেছিল ২০১৭ সালে। সেই রিপোর্ট এতটাই উজ্জ্বল যে সরকার তা প্রকাশ করেনি। যদিও সেই রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায় এবং জানা যায় ভারতের গ্রামগুলিতে প্রকৃত ভোগব্যয় ক্রমাগত কমছে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড় সহ ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা কমতে থাকায় সেই খাতে খরচ তথা কার্যকরী চাহিদা কমছে। অতি সম্প্রতি গত ৩১ জানুয়ারি প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে, দেশে চাহিদা বৃদ্ধির গড় হার ৫ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ মোদি সরকারের শাসনে একদিকে আয়ের অভাব, অন্যদিকে জিনিসপত্রের চড়া দাম— সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের দিন চালানো দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। অপুষ্টি, ক্ষুধা মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। ভারত সরকারের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ২০২৩-এর এপ্রিল মাসে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা দেখিয়েছে, দেশে দু'বছরের কম বয়সী শিশুদের ২০ শতাংশ, সংখ্যায় যা প্রায় ৬০ লক্ষ, দিনভর না খেয়ে থাকে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ১১১ নম্বরে। শতাংশের হিসাবে বিশ্বের মধ্যে অপুষ্টি-অনাহারের কারণে ঠিকমতো বাড়তে না পারা সবচেয়ে বেশি শিশু রয়েছে ভারতে। গর্ব করার মতো বিষয়ই বটে! অর্থমন্ত্রী কথিত উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী নিশ্চয় ভারতের কৃষকরাও। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের যে প্রতিশ্রুতি মোদি সরকারের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন কৃষকরা, চরম নির্লজ্জের মতো আজও তা চালু করেনি সরকার। আয় কমেছে গোটা কৃষিক্ষেত্রেই। কেন্দ্রে মোদি সরকার আসীন হওয়ার বছর ২০১৪ থেকে ২০২২-এর মধ্যে মূলত বিপুল ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে কৃষিতে নিযুক্ত ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমান যেমনই হোক, অর্থমন্ত্রী যখন বলেছেন, তখন এই কৃষকরা নিশ্চয় তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী! মহিলারাও হয়ত খুশি তাঁদের বর্তমান জীবন নিয়ে। কারণ দেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা। কাজের বাজারে মেয়েদের যোগদান কমছে। মহিলাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে মজুরিবিহীন কাজে। অপুষ্টিতে ভুগছেন দেশের প্রায় অর্ধেক মহিলা। আনন্দিত হওয়ারই তো কথা! যাঁদের নিয়ে অহরহ প্রধানমন্ত্রীর গৌরববাণী বর্ষিত হয়, কী অবস্থা সেই যুবশক্তির? সরকারি তথ্যই বলছে, দেশে ১৫-২৯ বছর বয়সিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১০ শতাংশ, আর ২৫ বছরের কমবয়সি স্নাতকদের মধ্যে ৪৩ শতাংশই কর্মহীন। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের আরেকটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দেশে স্নাতক বা তার চেয়েও বেশি শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী তরুণদের প্রতি ৪ জনে একজন কর্মহীন। অর্থমন্ত্রী সেদিন সংসদে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই বলেছিলেন!

মুখে তিনি যাই বলুন, অর্থনীতির এই বেহাল দশা নিশ্চয়ই অর্থমন্ত্রীর অজানা নয়। এই অবস্থায় রামরাজ্য তৈরি করা না হোক দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে একটা সরকারের তো উচিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি এবং সমাজকল্যাণমূলক খাতগুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা! কিন্তু দেখা গেল, গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ সালেও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট খরচের মাত্র ১.৮ শতাংশ। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট খরচের মাত্র ২.৫ শতাংশ। বাজেট নথিতে দেখা গেল, গত অর্থবর্ষে কৃষিক্ষেত্রে যা বরাদ্দ হয়েছিল, তার তুলনায় ৪ হাজার কোটি টাকা কম খরচ করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ টাকার মধ্যে ৯ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়নি। একই পরিস্থিতি সংখ্যালঘু, দলিত ও আদিবাসী উন্নয়ন খাতগুলির। ফলে স্পষ্ট যে কেন্দ্রের মোদি সরকার দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের অগ্রগতির জন্য কতখানি আন্তরিক। বিপিএল তালিকাভুক্ত বয়স্ক মানুষ, মহিলা ও বিকলাঙ্গ মানুষকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রকল্প জাতীয় সামাজিক সহযোগিতা কর্মসূচির বরাদ্দও এবার নামমাত্র করা হয়েছে। এর পরিমাণ মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ০.২ শতাংশ। বাস্তবে ২০১৪ সালে সরকারে বসার পর থেকেই জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির দায়িত্ব ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলছে মোদি সরকার। এবারের বাজেট নথি দেখাল, গত অর্থবর্ষে মহিলা, শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দের তুলনায় কম টাকা খরচ করা হয়েছে। খাদ্যে ভরতুকি ছাঁটাই করা হয়েছে। গত বছরের বরাদ্দ ২.১ লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে তা এবার হয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। মহিলাদের জন্য বরাদ্দ অর্থ ৪ শতাংশ থেকে কমে ০.০৬ শতাংশে নেমেছে। নারী নির্যাতন ব্যাপক পরিমাণে বাড়লেও নির্ভয়া ও মিশন শক্তির পুরো বরাদ্দ খরচ করা হয়নি এবং এবারের বাজেটে বরাদ্দ এক পয়সা বাড়ানোও হয়নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কর্মসংস্থানের যখন এই হাঁড়ির হাল, তখন এনরেগা প্রকল্পে এবারের বাজেটে চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় এক টাকাও বাড়ানো হল না। অথচ সকলেই জানেন, এই এনরেগা প্রকল্প তথা একশো দিনের কাজ লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মানুষের রুটি-রুজির অন্যতম সংস্থান হিসাবে কাজ করে। আকাশছোঁয়া বেকারত্বে জনজীবন যখন জেরবার, তখনও বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনও রকম দিশা পাওয়া গেল না। কৃষিক্ষেত্রেরও একই হাল। সেখানকার বিভিন্ন বিভাগে যে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। সারে ভরতুকির পরিমাণ গত অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১.৯ লক্ষ কোটি থেকে কমিয়ে এবার করা হয়েছে ১.৬ লক্ষ কোটি। কৃষি উৎপাদনের উন্নতির নাম করে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে সেগুলি থেকে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফা লোটারই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে মোদি সরকার। অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক রিপোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে মানুষে মানুষে বিপুল বৈষম্যের ছবি দেখিয়ে দিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২-২০২১-এর মধ্যে দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ জমা হয়েছে ধনীতম ১ শতাংশের হাতে, আর দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। এই প্রবল বৈষম্য দূর করারও কোনও চেষ্টাও বাজেটে পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল, একচেটিয়া ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি ও ধনকুবেরদের থেকে যে প্রত্যক্ষ কর আদায় করে সরকার, তা কমেছে। জনসাধারণের ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর থেকে আদায় করা পরোক্ষ করের পরিমাণ ক্রমাগত তার চেয়ে বেড়ে চলেছে। জনগণের জন্য সামান্য সুরাহার বন্দোবস্ত করতে পরোক্ষ কর কমানোর কোনও ঘোষণা অর্থমন্ত্রী করলেন না।

বাস্তবে এই অন্তর্বর্তী বাজেট দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত উদাসীন ও নির্মম দৃষ্টিভঙ্গিটিকে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়ে গেল। দেখিয়ে দিয়ে গেল, করের ভার, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি আর গরিবিতে বিধ্বস্ত এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য সামান্যতম দরদ এই সরকারের নেই। তাদের যাবতীয় দায়বদ্ধতা শুধু একচেটিয়া মালিকদের প্রতি। তাই গোটা বাজেটে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিষ্পিষ্ট, নাজেহাল সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র প্রবীণ সংগঠক ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পার্টি সদস্য কমরেড অসিত দাস দাস দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ২৬ জানুয়ারি রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ষাটের দশকের

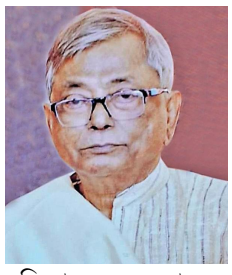

মাঝামাঝি সময়ে কমরেড নিত্যানন্দ বসুর মাধ্যমে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। তখন থেকেই হালতু, কসবা, যাদবপুর ও দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই পর্যায়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তাঁকে ছাত্র সংগঠনের কলকাতার দক্ষিণ শহরতলী জেলার সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বহরমপুরে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্মেলনে তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর নেতৃত্বের নির্দেশে ছাত্র সংগঠনের বিস্তারের কাজে বিভিন্ন জেলায় তিনি কাজ করেছেন এবং যথেষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। হাওড়া জেলা ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছাত্র সংগঠন ও পার্টি সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই একটা সময় হালতু এলাকায় পার্টি ও গণ সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল। '৯০-এর দশকে যখন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি গড়ে ওঠে সেই সংগঠনের শুরু থেকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিয়ে গ্রাহক সমিতি গড়ে তুলেছেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়ভাবে দলীয় কাজকর্মে অংশ নিতে পারতেন না। এ নিয়ে তাঁর যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণা ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিদ্যুৎ সংগঠনের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল এক প্রবীণ দক্ষ সংগঠককে হারাল।

২৭ জানুয়ারি কমরেড অসিত দাস দাসের মরদেহ কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪৮ লেনিন স্মরণে নিয়ে আসা হয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য। দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অশোক সামন্ত। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়, রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড রবি বসু সহ অন্যান্য রাজ্য কমিটির সদস্যরা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কমরেডরা শ্রদ্ধা জানান। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের পর তাঁর মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

কমরেড অসিত দাস দাস লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৬)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার ষোড়শ কিস্তি।

রাষ্ট্র বিলোপের অর্থনৈতিক ভিত্তি

তাঁর "ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম"-এ মার্ক্স এই প্রশ্নের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। (ব্র্যাকের প্রতি চিঠি, ১৮৭৫ সালের ৫ মে। ১৮৯১ সালে নিউ জেইট পত্রিকার নবম সংখ্যায় এই চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। এবং একটা বিশেষ সংস্করণে রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার আগে এই পত্র প্রকাশিত হয়নি।) এই উল্লেখ্যযোগ্য রচনার বিতর্কমূলক অংশে রয়েছে লাসালেবাদের সমালোচনা। বলতে গেলে, এই বিতর্কমূলক অংশ এর ইতিবাচক দিককে ঢেকে দিয়েছে। এই ইতিবাচক অংশে সাম্যবাদের বিকাশের সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিলোপের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মার্ক্স যেভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন

ব্র্যাককে লেখা মার্ক্সের চিঠি (১৮৭৫ সালের ৫মে) এবং যে চিঠির কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, সেই বেবেলকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি (১৮৭৫ সালের ২৮ মার্চ)— এই দুটির মধ্যে উপর উপর তুলনা করলে মনে হতে পারে, এঙ্গেলসের তুলনায় মার্ক্স অনেক বেশি 'রাষ্ট্রের পক্ষে' কথা বলেছেন। এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নে এই দুই লেখকের মধ্যে চিন্তার পার্থক্য অনেক।

এঙ্গেলস বেবেলকে বলেছিলেন, রাষ্ট্র সম্পর্কে বকবকানি একেবারেই বন্ধ করা দরকার। তিনি বলেছিলেন, গোথা কর্মসূচি থেকে 'রাষ্ট্র' কথাটা বাদ দেওয়া প্রয়োজন এবং এর পরিবর্তে 'কমিউনিটি' শব্দটা ব্যবহার করতে হবে। এমনকী এঙ্গেলস এই ঘোষণাও করেছিলেন, যথার্থ অর্থে বলতে গেলে কমিউন আর কোনও রাষ্ট্রই ছিল না। যদিও মার্ক্স এমনকি 'কমিউনিস্ট সমাজে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের' কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ, যেন, সাম্যবাদেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে মার্ক্স স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এই ধরনের চিন্তা মৌলিক দিক থেকেই ভ্রান্ত। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্র এবং তার বিলোপের প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের চিন্তা হুবহু এক। উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যে মার্ক্স বিলোপের প্রক্রিয়ায় থাকা রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন।

স্পষ্টতই, রাষ্ট্র ভবিষ্যতের ঠিক কোন মুহূর্তে 'বিলুপ্ত হয়ে' যাবে তা বলতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেন না, এটা অবশ্যই একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মধ্যে আপাত পার্থক্যের কারণ হল, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁদের লক্ষ্যও ছিল আলাদা। রাষ্ট্র সম্পর্কে চালু থাকা সংস্কারগুলি কতটা অসার তা এঙ্গেলস খুব জোরের সাথে, স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে বেবেলকে দেখানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। লাসালের মধ্যেও এই সংস্কারের ভাগ কিছু কম ছিল না। মার্ক্স শুধু প্রসঙ্গক্রমে এই কথার উল্লেখ করেছেন। তাঁর আগ্রহ ছিল অন্য বিষয়ে, তা হল সাম্যবাদী সমাজের বিকাশ হবে কী ভাবে।

মার্ক্সের সমগ্র তত্ত্ব হল, আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুসমঞ্জস, পরিপূর্ণ, অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সংহত প্রয়োগের তত্ত্ব। স্বাভাবিকভাবেই, পুঁজিবাদের আসন্ন ধ্বংস ও আগামী সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যৎ বিকাশের ক্ষেত্রে কেমন ভাবে এই তত্ত্বের প্রয়োগ হবে, মার্ক্সের সামনে ছিল সেই প্রশ্নটি।

তা হলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ বিকাশকে আলোচনা করা যেতে পারে?

এই তথ্যের ভিত্তি— সাম্যবাদের উৎস হল পুঁজিবাদ। সাম্যবাদ ঐতিহাসিক ভাবে পুঁজিবাদ থেকে বিকশিত হয়েছে। পুঁজিবাদ জন্ম দিয়েছে এমন একটা সামাজিক শক্তির, যার ক্রিয়ার ফলই হল সাম্যবাদ। মার্ক্স কখনওই কল্পরাজ্য সৃষ্টি করতে চাননি। যা জানা নেই, সে সম্পর্কে অলস অনুমানের কোনও চেষ্টাই তিনি করেননি। একজন প্রকৃতিবিদ জীববিজ্ঞানে একটা নতুন প্রজাতির উদ্ভব, তার উৎস ও পরিবর্তনের গতিধারা সম্পর্কে জানার পর সে বিষয়ে যে ভাবে আলোচনা করেন, মার্ক্সও সাম্যবাদ সম্পর্কে সেই ভাবে আলোচনা করেছেন।

গোথা কর্মসূচির বিভ্রান্তিকে পাশে সরিয়ে রেখে সর্বপ্রথমে মার্ক্স রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"বর্তমান সমাজ পুঁজিবাদী সমাজ। সমস্ত সভ্য দেশেই এই পুঁজিবাদী সমাজ আছে। মধ্যযুগীয় রীতিনীতি থেকে কমবেশি মুক্ত, কমবেশি উন্নত এই দেশগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ কমবেশি পরিবর্তিত ও কমবেশি বিকশিত। অন্যদিকে, 'বর্তমান দিনের রাষ্ট্র' সীমানা পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। সুইজারল্যান্ডের সাথে প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্যের পার্থক্য আছে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইংল্যান্ডের পার্থক্য আছে। তাই 'বর্তমান দিনের রাষ্ট্র' একটি অলীক বস্তু।

"বিভিন্ন সভ্য দেশের রাষ্ট্রগুলোর নানা ধরন এবং ব্যবস্থার বহু রকমের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এদের মধ্যে একটা মিল আছে। তা হল, এই সব রাষ্ট্রের ভিত্তি হল পুঁজিবাদী সমাজ। একটা একটু বেশি আর একটা একটু কম বিকশিত হলেও তারা পুঁজিবাদী পথেই বিকশিত। তাই, এদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে। এই অর্থে 'বর্তমান দিনের রাষ্ট্র' সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে যখন এর ভিত্তি, পুঁজিবাদী সমাজের আর অস্তিত্ব থাকবে না, বিষয়টি ঠিক এর বিপরীত হবে।

"তা হলে প্রশ্ন ওঠে ঃ কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্রের কী ধরনের রূপান্তর ঘটবে? অন্য কথায় বলতে গেলে, বর্তমান রাষ্ট্রের কাজের সাথে তুলনীয় কোন সামাজিক কাজগুলি তখনও বজায় থাকবে? একমাত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রের সাথে 'গণ' কথাটা জুড়ে দিয়ে হাজার রকমের জোটপাট খাওয়ালেও এই প্রশ্নের সমাধানের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারা যাবে না।

এইভাবে 'গণ রাষ্ট্র' সম্পর্কে সব কথার প্রতি বিদ্রুপ করে মার্ক্স প্রশ্নটিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন ও আমাদের সতর্ক করে বলেছিলেন, একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

বিকাশের সামগ্রিক তত্ত্ব, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে যে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ একটা স্তর বা রূপান্তরকালীন একটা পর্যায় থাকতেই হবে। এই তত্ত্ব পুরোপুরি সঠিক। কল্পনাবিলাসীরা এই কথাটা ভুলে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত বর্তমানের সুবিধাবাদীরাও এই কথাটা মনে রাখেনি। (চলবে)

আন্দামানে নেতাজি স্মরণ

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী যোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। লিটল আন্দামানের পাঁচটি গ্রামে মাল্যদানের পর ২৩ জানুয়ারি বিকেলে রামকৃষ্ণপুর বাজারে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মূল অনুষ্ঠানটি হয়। স্থানীয় সংগঠক বিজন কুমার মণ্ডল এবং মূল আলোচক বলরাম মান্না বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পোর্ট ব্লেয়ারের ভাতু বস্তি, সোলদারিতে অনুষ্ঠান হয়।

পুঁজিপতিদের ২.১৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বিলকুল মুছে দেওয়া হল

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কীভাবে উন্নতির পর উন্নতি হচ্ছে ব্যাঙ্কের, তারই খতিয়ান। ব্যাঙ্কের সম্পদের ঠিকুজির হাল হকিকৎ। ব্যাঙ্কের যে সম্পদ কাজে লাগে না, পরিভাষায় যার নাম এনপিএ বা নন-পারফর্মিং অ্যাসেট, ২০২২-২৩ সালে ২১ শতাংশ ছাপিয়ে উঠেছিল, তার পরিমাণ কমে গেল। ২০২২-২৩-এ অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণ হিসেব থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর পরিমাণ ২.১৭ লক্ষ কোটি টাকা। এর আগের অর্থনৈতিক বছরে তামাদি টাকার পরিমাণ ছিল ১.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা। তামাদির পরিমাণ বেড়েছে।

রাজ্যসভায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভগৎ কারাড সুসমাচার দিয়ে জানিয়েছেন, গত পাঁচটি অর্থনৈতিক বছরে ১০.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা এইভাবে পাওনার খাতা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ .৫২ লক্ষ কোটি টাকা বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর থেকে পাওনা ছিল। অনাদায়ী টাকার বোঝাটা বেশ বড়সড়। এইভাবে অনুৎপাদক সম্পদের অনুপাত ২০১৮-১৯ সাল থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে।

এই নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) সমস্ত ব্যাঙ্কের সম্মিলিত পরিমাণ ৫.৭১ লক্ষ কোটি টাকা ২০২২-২৩-এ। এর পরিমাণ গত বছরের ৭.৪৩ লক্ষ কোটি টাকার কম। এই কমে যাওয়াকে দেখিয়ে অর্থনীতির উন্নয়নের বড়াই করছে সরকার। আসলে এর পিছনে রয়েছে অন্য খেলা। বিপুল পরিমাণ এনপিএ ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা থেকে মুছে ফেলে দেখানো হচ্ছে এর পরিমাণ কমে গেছে।

পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, বিদেশি ব্যাঙ্ক, স্বল্প বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক— সবক্ষেত্রেই এই ঋণ তামাদির চিত্রটি বেশ ঝকঝকে। পণ্ডিত লোকের ভাষার খোলস ছেড়ে দিলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তা সুদে-আসলে মেরে দেওয়াটা খাসা বৈধতা পেয়েছে। সেখানে এনপিএ নাম মাহাত্ম্য আনতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকা হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের রক্ত জল করা আমানতের টাকা। সেই টাকা বড় বড় শিল্পপতিরা ঋণ নিয়ে গায়েব করে দিচ্ছে। সুদ-আসল আদায় করা দূরস্থান, পাওনার হিসাব মুছে দিয়ে খাতির করা হচ্ছে। আবার ব্যাঙ্কের ক্ষতি পূরণ করা হচ্ছে পাবলিকের জমা টাকা ও করের টাকা থেকে। গোটা জাতির প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা উন্নয়নের নামে কি চলতেই থাকবে?

উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত না রেখে ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ ঋণ দেবেই বা কেন? বিদেশি ব্যাঙ্কের এমন ঋণ ৫০ শতাংশ। প্রাইভেট ব্যাঙ্কে এই ঋণ ২৭.৩ শতাংশ। পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কে ৫০ শতাংশ, প্রাইভেট ব্যাঙ্কে এই ঋণ ২২.৬ শতাংশ। সব মিলিয়ে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ঋণনীতিতে ঋণখেলাপি করে জনগণের টাকা তছরুপের ব্যবস্থাটা বেশ জেঁকে বসেছে। একজন সাধারণ মানুষ অল্প ঋণ নিয়ে ব্যবসা সংকটের জন্য ঠিকঠাক শোধ না করতে পারলে তাঁর পিছনে পুলিশ লাগে। ঘরবাড়ি ক্রোক হয়। আর যারা বিপুল পরিমাণে টাকা গায়েব করছে তাদের উন্নতি হয়। আধুনিক ব্যাঙ্ক অর্থনীতির সার কথা এটাই।

সংক্ষেপে

বিমার নিয়ম বাতিলের দাবি

জলমগ্ন হওয়ার আড়াই মাস পর অবশেষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিমা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হল। এ জন্য কৃষক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামতে হয়েছে মানুষকে। জেলার ১৩টি ব্লকের ১০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৬৩ জন আমন ধান চাষিকে মোট ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০ টাকা ওই ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেওয়া হবে বলে বিমা কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ক্ষোভের সাথে বলেন, কোলাঘাট ব্লকের সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমিরচক, দেউলবাড় মৌজার বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে ক্ষতি হলেও তালিকায় ওই এলাকার কৃষকদের নাম নেই। ব্লকের ৫০ শতাংশ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত না হলে ক্ষতিপূরণ হবে না বলে যে নিয়ম রয়েছে তা বাতিলের দাবি জানান তিনি।

সিএএ বিরোধী মিছিল

২৮ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে এনআরসি-সিএএ বাতিল, ইউএপিএ, টাডা, পোটা সহ সর্বনাশা কালাকানুন প্রত্যাহার, দেশের সকল নাগরিকদের জীবন-জীবিকার অধিকার সুনিশ্চিত করা ও সম-মর্যাদার দাবিতে সিপিডিআরএস মিছিল করে। এ দিন শহরের জাগরী হলে প্রকাশিত হয় সংগঠনের মুখপত্র 'পিপলস্ রাইটস'-এর জানুয়ারি সংখ্যা। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী আবদুস সালাম এবং বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ মুজতবা আলি, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত, সম্পাদক রাজকুমার বসাক, কার্যকরী সভাপতি সৌম্য সেন সহ অন্যরা।

বইমেলায় পুলিশি হামলার প্রতিবাদ

কলকাতা বইমেলায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশি হামলার নিন্দা করেছে সিপিডিআরএস। ৩০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি শান্তিপূর্ণ উপায়ে তুলে ধরার অপরাধে কলকাতা বইমেলাতে একদল পড়ুয়াকে পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে মেলার বাইরে বের করে দেয়, থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং মুক্ত প্যালেস্টাইনের পক্ষে লেখা পোস্টার হিন্দুত্ববাদীরা ছিঁড়ে দিলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

পরিবেশ সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে, একটি সবুজ ও দূষণমুক্ত সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ২৭-২৮ জানুয়ারি বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় অনুষ্ঠিত হল 'দ্য গ্লোবাল গ্রিন ফোর্সে'র ষষ্ঠ বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। প্রথমদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। পরদিন পরিবেশ বিষয়ক নৃত্যনাট্য, 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি'র পক্ষ থেকে কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী, শব্দদূষণ বিরোধী আলোচনা, অরণ্য ও পরিবেশ ধ্বংস-বিরোধী আলোচনা এবং পরিবেশ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। সম্মেলন থেকে কাকলী দত্ত বসুকে সভানেত্রী, অর্ক মালিককে সম্পাদক ও সত্যজিৎ দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৩ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

জাতীয় সড়কে আন্ডারপাসের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরে দেউলিয়া বাজারে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিতে ১১ জানুয়ারি দেউলিয়া বাজার ফ্লাইওভার কাম সাবওয়ে নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে কোলাঘাট ব্লকের বিডিও এবং সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির সভাপতি দেউলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরহরি পাল, সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, স্বদেশ রঞ্জন সাউ, মেঘনাথ খামরই, বিশ্বনাথ কান্ডার, রাজকুমার মাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি ২ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি পেশ করে।

লেনিন স্মরণে আলোচনাসভা জেলায় জেলায়

শোষণমুক্তির পথপ্রদর্শক লেনিনের চিন্তাধারা চর্চায় এলাকায় এলাকায় গড়ে ওঠা লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ কমিটিগুলির প্রয়াস অব্যাহত। যতদিন শোষণ-অত্যাচার থাকবে, এই

প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি বেশি অনুভূত হবে। তাঁর মৃত্যুশতবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠানের পরেও আগামী এক বছর কমিটি নানা কর্মসূচি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৭ জানুয়ারি নদিয়ায় কৃষ্ণনগর পৌরসভা হলে 'মহান লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উদযাপন কমিটি' আয়োজিত সভায় (ছবি) বক্তব্য রাখেন আরএসপি-র প্রাক্তন জেলা সম্পাদক শংকর সরকার, সিপিআই-এমএল (লিবারেশন)-এর অমল তরফদার, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী এবং এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক মৃদুল দাস। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মলয় সরকার। আগামী দিনগুলিতেও তিনি কমিটির উদ্যোগে মহান লেনিনের দর্শনচিন্তা ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক তনয় মাজি। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রমজীবী থেকে শুরু করে শহরের বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিরা। ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত লেনিনের জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে এদিন লেনিন স্মারক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

২৭ জানুয়ারি পুরুলিয়ার বিদ্যাসাগর স্মৃতি কক্ষে লেনিন মৃত্যু শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি, পুরুলিয়া শহরের উদ্যোগে আয়োজিত 'আজও কেন লেনিন' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌরভ মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি শিক্ষক দয়াময় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দাস। বক্তব্য রাখেন কমিটির সম্পাদক অভিযান ভট্টাচার্য। সভায় শহরের বহু বিশিষ্টজন ও বিভিন্ন বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

আন্দোলনের চাপে মালদায় আটক মোটরভ্যান ছাড়ল প্রশাসন

১৯ জানুয়ারি জাতীয় সড়কের মালদা বাইপাসে এম ভি আই দুটি মোটরভ্যান আটক করে। ২৪ জানুয়ারি সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক কার্তিক বর্মনের নেতৃত্বে মোটরভ্যান চালকেরা আরটিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন কোনও মোটরভ্যান রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে না, এবং ধরা পড়লে সেগুলি ভেঙে দেওয়া হবে—এই হুমকি দেন।

আটকে রাখা মোটরভ্যানগুলি ছেড়ে দেওয়া, ধরপাকড় বন্ধকরার দাবিতে ও মোটরভ্যান চালকদের হয়রানির প্রতিবাদে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৩০ জানুয়ারি মালদা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও ডি এম ডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়। মিছিলে দুই হাজার মোটরভ্যান চালক যোগ দেন। ইউনিয়নের অনড় মনোভাব দেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ আটকে রাখা মোটরভ্যানগুলি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ও আর ধরপাকড় করা হবে না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চালকদের

মালদা শহরে মোটরভ্যান চালকদের সভা

সামনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি অংশুধর মণ্ডল, সম্পাদক কার্তিক বর্মন ও গণআন্দোলনের নেতা গৌতম সরকার। তাঁরা বলেন, শিল্পবিহীন এই জেলা। সরকার কাজ দিতে পারছে না, বিপরীতে জীবিকার উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে স্কিম ওয়ার্কারদের প্রতি প্রতারণা

কেন্দ্রীয় বাজেটে আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে যুক্ত করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার 'আয়ুষ্মান ভারত' স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু আছে। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প এ রাজ্যে নেই। আর এই সুবিধা আদৌ পাওয়া যাবে কি না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। কারণ এই সমস্ত সুবিধা পাওয়া অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। অন্যান্য রাজ্যের কর্মীদেরও একই অভিজ্ঞতা। স্কিম ওয়ার্কারদের প্রয়োজন ছিল মাসিক ভাতা বৃদ্ধি ও কর্মীর মর্যাদা। কিন্তু সরকার এই সমস্ত কর্মীদের ন্যূনতম আর্থিক দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতেই এই ঘোষণা করেছে। মাসিক ভাতা বৃদ্ধির দাবি এড়িয়ে যেতেই কেন্দ্রের সরকার এই চালাকির পথ নিয়েছে।

তিনি বলেন, দেশে এক কোটিরও বেশি স্কিম ওয়ার্কার অক্লান্ত পরিশ্রম করে সরকারের দেওয়া কাজগুলি করছে। কর্মীদের সাথে সরকার 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে। বছর বছর বাজেট পেশ করা হচ্ছে কিন্তু এই সমস্ত প্রকল্পের কর্মীদের জন্য ন্যূনতম ভাতা বৃদ্ধি করছে না। আগে পেটের ভাত, তারপর তো স্বাস্থ্যবিমা। বাজেটে তা কোথায়?

ক্ষুদ্রশিল্পে ধর্মঘট

একের পাতার পর

বক্তব্য রাখেন প্যাডি অ্যান্ড হুইটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অর্জুন কুণ্ডু, শালবনি থানা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তারকনাথ মোদক, মেদিনীপুর শহর ক্ষুদ্রশিল্প সংগঠনের নেতা শিশির দত্ত, হরপ্রসাদ জানা। ওই দিন বেলদা ও ঘাটালে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে তিন শতাধিক গ্রাহকের উপস্থিতিতে সভা হয় ও শেষে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকা নেতা স্বপন ভূঞ্যা।

রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প বাঁচাতে বর্ধিত ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার এবং গ্রাহকদের টাকা লুট করার যন্ত্র স্মার্ট মিটার বাতিল না করলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করা হবে বলে জানান অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

দিল্লিতে শহিদ কৃষকদের স্মারক বেদির জন্য জমির দাবি

দিল্লির সিংঘু এবং টিকরি সীমান্তে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে দীর্ঘ ১৩ মাস ধরে চলা কৃষক আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ৭৩৬ জন কৃষকের স্মৃতিতে শহিদ বেদি স্থাপনের জন্য অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) দিল্লি ও হরিয়ানা সরকারের কাছে জমি দেওয়ার জন্য দাবি জানাল। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান এবং সর্বভারতীয় সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ বলেন,

১৬ জানুয়ারি পাঞ্জাবের জলন্ধরে সংযুক্ত কিসান মোর্চার জাতীয় সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিংঘু এবং টিকরি সীমান্তে কিসান শহিদ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর জন্য দিল্লি ও হরিয়ানা সরকারের কাছে বিনামূল্যে জমি দেওয়ার জন্য দাবি করা হয়।

জলন্ধর সম্মেলন থেকে সারা দেশের কৃষকদের এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে দিল্লি ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি লেখার আবেদন জানানো হয়েছে।

২০২১-এ বিজেপি সরকার দেশ-বিদেশের একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থে যে তিনটি কালা কৃষি আইন পাশ করেছিল তা বাতিল করার জন্য কৃষকরা তাদের জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই কালা কৃষি আইনে বলা হয়েছিল সব ধরনের শস্য, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল ও তৈলবীজ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা মজুতদার ও কালোবাজারিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এপিএমসি বাজারগুলি তুলে দিয়ে কৃষিপণ্যের সম্পূর্ণ ব্যবসা বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উৎস কৃষিজমিকে কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চুক্তিচাষের কথা এই আইনে ছিল।

মোদি সরকারের এই কালা আইন যদি বাতিল করা না যেত, গ্রাম এবং শহরের গরিব মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবী জনগণ অনাহারে মারা যেত এবং চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে তার জমি বিক্রি করতে বাধ্য হত। যে মূল্যবৃদ্ধি অসহনীয় হয়ে উঠেছে তা আরও ভয়াবহ হত। এর ফলে দেশের কৃষক ও খেতমজুররা তাদের জীবন-জীবিকা হারিয়ে কোম্পানির গোলাম হয়ে যেত। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃষকরা দিল্লির রাজপথে মাসের পর মাস অবস্থান আন্দোলন করেছেন। প্রবল তাপদাহ ও ঠাণ্ডা অগ্রাহ্য করে বা নানা অসুস্থতা নিয়েও ধরনায় বসে, জীবন দিয়ে আম্বানি-আদানিদের মতো বৃহৎ পুঁজিপতি ও তাদের সেবাদাস মোদি সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করে অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছেন।

একই সাথে গাজিপুর, ধানসা সীমান্ত এবং শাহজাহানপুর, পালওয়াল ও সুনহেদা সীমান্তেও কৃষকরা ধরনায় বসেছিলেন। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস থেকে শুরু করে একটার পর একটা সরকার যেভাবে কৃষকদের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে ও পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থবাহী নীতি গ্রহণ করেছে, তা থেকে কৃষকদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, যদি তাদের কৃষিজমি, জমিতে উৎপাদিত ফসল ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হয় তা হলে পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি আইনের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করা ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের চাপে মোদি সরকার চাষিদের ঋণ মকুব করা ও কমপক্ষে উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মোদি সরকার চাষিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিতে মোদি সরকার ও এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী, খালিস্তানি, আন্দোলনজীবী ইত্যাদি শব্দ কৃষকদের দিকে বিষাক্ত তিরের মতো ছুঁড়ে দিয়েছিল, কিন্তু আন্দোলনের গমকে কৃষকরা তা শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দিয়েছিল।

কৃষকদের এই আন্দোলন দেশের জনগণের মন জয় করে নিয়েছিল। ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী, দোকানদার এবং বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ দেশের সমস্ত অংশের জনগণ এই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল। এই আন্দোলন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিকতা, ভাষা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে যে সমস্ত সামাজিক বৈষম্য আছে তা দূর করে সমস্ত মানুষকে এক সূত্রে গেঁথেছিল।

এই আন্দোলনে যে কৃষকরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতিতে শহিদ স্মৃতিসৌধ তৈরি করা দেশের সমস্ত কৃষক এবং শ্রমিকদের কর্তব্য। সমস্ত ধরনের শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আসন্ন সংগ্রামের জন্য আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে এই স্মৃতিসৌধগুলি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালিতে

ট্রাক্টর নিয়ে কৃষক বিক্ষোভ

জানুয়ারি মাস থেকেই ফ্রান্সের কৃষকরা চালাচ্ছেন লাগাতার আন্দোলন। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ সরকারের কৃষি-বিরোধী পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে কৃষকরা প্যারিস বিমানবন্দর সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি অবরোধ করেন। রাজপথগুলি সারি সারি ট্র্যাক্টর দিয়ে অবরোধ করে, দিন-রাত ব্যারিকেড করে গোটা দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ কৃষকরা। পুলিশ রেকর্ডই বলছে, শুধু জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ৪৫০০টি ট্র্যাক্টর দিয়ে ৮০টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৬,৫০০ জন কৃষক। টায়ার পুড়িয়ে ও প্রশাসনিক ভবনগুলিতে গোবর ছড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কৃষকরা। মনে পড়ে দিল্লির বুকে ২০২১-এর ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের কথা। বিজেপি সরকারের কৃষকমারা নীতির প্রতিবাদে কৃষকদের লাগাতার ১৩ মাস অবস্থান এবং সারি দেওয়া ট্রাক্টর মিছিলের কথা।

ফসলের ন্যায্য দাম, বিদেশ থেকে আমদানি ফসলে অনুদান কমিয়ে দেশীয় কৃষিজ দ্রব্য বিক্রিতে সুবিধা দেওয়া, ডিজেলের উপর থেকে বাড়তি ট্যাক্স প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তাল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন হাজার হাজার কৃষক। বহু জায়গায় টিভিতে প্রধানমন্ত্রীকে ভাষণ দিতে দেখে টিভির উপর সসেজ ছুঁড়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতীক স্বরূপ এক কৃষকের কুশপুতুলের গলায় ফাঁস লাগিয়েও প্রতিবাদ জানান কৃষকরা।

এ বারের সামার অলিম্পিকের আয়োজক দেশ ফ্রান্স। প্রতিবাদী কৃষকরা হুমকি দিয়েছেন সরকার দাবি না মানলে তাঁরা রাজধানী অবরোধ চালিয়ে যাবেন। বিক্ষোভকারীদের দমাতে হাজার হাজার পুলিশ নামায় সরকার, গ্রেপ্তার করে জেলে পোরে কৃষকদের। কিন্তু আন্দোলন থেকে নিরস্ত করতে পারেনি তাঁদের।

বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ে প্রতিবেশী দেশ বেলজিয়ামেও। রাজধানী ব্রাসেলস এবং প্যারিসের সংযোগকারী প্রধান রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা। ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি, কম আয় এবং ডিজেল ব্যবহারে সুবিধা বাতিলের প্রতিবাদে ইটালির রোমে কৃষকরা ট্রাক্টর দিয়ে রাজপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। রোমানিয়া, পোলান্ড, জার্মানিতেও ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। ১৫ জানুয়ারি কৃষি-জ্বালানিতে ভর্তুকি ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ৫ হাজার ট্রাক্টর নিয়ে ১০ হাজারের বেশি কৃষক বার্লিনের রাস্তায় মিছিল করেছেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশও কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। স্পেনের কৃষকরা আন্দোলনে নামার কথা ঘোষণা করেছেন। দেশে দেশে পুঁজিবাদের সেবক সরকারগুলি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য সবরকম সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর সঙ্কটের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। একই সাথে পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি দেশে দেশে জন্ম দিচ্ছে।

জার্মানিতে ৬ দিনের রেল ধর্মঘট

'জার্মান ট্রেন চালক ইউনিয়ন'-এর নেতৃত্বে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২টো থেকে ২৯ জানুয়ারি সন্ধেপর্যন্ত ৬ দিনের লাগাতার রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন জার্মানির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত রেল কোম্পানির ট্রেন চালকরা। সাপ্তাহিক কাজের সময় ৩৮ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৩৫ ঘন্টা করা, বেতন বাড়ানো এবং দেশের সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে বোনাস দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা এই ধর্মঘট ডেকেছিলেন। জার্মানির ইতিহাসে এটি ছিল রেল শ্রমিকদের ডাকা দীর্ঘতম সময়ের ধর্মঘট।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদক শংকর দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে বলেন, গোটা ইউরোপ জুড়েই পুঁজিবাদী শাসকের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার উঠছে, শাসকের দমনপীড়ন, চোখরাঙানি পরোয়া না করে শ্রমিকরা তাঁদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামছেন। স্পেনের বিভিন্ন বিমানবন্দরের কর্মচারী ও নিরাপত্তারক্ষীরা কর্মক্ষেত্রের অমানবিক পরিস্থিতির উন্নতির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ২৪ জানুয়ারি ইটালি জুড়ে ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালিত হয়েছে গণপরিবহন কর্মচারীদের ডাকে। লন্ডনে ভূগর্ভস্থ রেলের কর্মচারীরা ৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘট পালন করে উদ্ধত কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছেন।

মহান লেনিন তাঁর 'অন স্ট্রাইক' রচনায় বলেছিলেন ঃ '...প্রতিটি ধর্মঘট শ্রমিকদের মনে করিয়ে দেয় যে, তাদের পরিস্থিতি হতাশাজনক নয়, তারা কেউ একা নয়। ধর্মঘটীদের উপরই শুধু নয়, আশেপাশের অন্যান্য কারখানার এবং একই শিল্পতালুকের অন্যান্য শ্রমিকদের উপরেও ধর্মঘটগুলি কী মারাত্মক প্রভাব ফেলে দেখুন। এমনি সময় শ্রমিক টুঁ শব্দটি না করে কাজ করে যায়, মালিকের বিরোধিতা করে না, নিজের অবস্থা নিয়েও মুখ খোলে না। কিন্তু ধর্মঘটের সময় সে সোচ্চারে নিজের দাবি জানায়, তার এতদিনের শোষণ-বঞ্চনার কথা মালিকের সামনে তুলে ধরে, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য লড়ে। এইসময় সে শুধুমাত্র নিজের কথা, নিজের মাইনের কথা ভাবে না, সে তার সমস্ত সহকর্মীর কথা ভাবে, যারা এতদিন তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যন্ত্র চালিয়েছে এবং আজ যারা কোনও শাস্তি বা ক্ষতির পরোয়া না করে শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।'

পাঠকের মতামত

মানুষকে ভাষা জোগায় গণদাবী

গত নভেম্বর থেকে ১২০ কপি গণদাবী বিক্রি করি। গ্রাহকদের সাথে প্রতি সপ্তাহে কাগজটি দিতে গিয়ে কিছু কথাবার্তা হয় বিভিন্ন বিষয়ে। কাগজের ভিতরের লেখাগুলি সম্পর্কেও খোঁজ নিই। জিজ্ঞেস করি, কেমন লাগছে গণদাবী। একজন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল-শিক্ষক বললেন, আমাদের বাড়িতে একটি দৈনিক পত্রিকা নেওয়া হয়। সেটি পড়ি ঠিকই কিন্তু বড় একঘেয়ে লাগে। কাগজের ভিতরে তেমন কিছু পাই না। কিন্তু গণদাবীতে যেভাবে লেখাগুলো আসে, সেগুলো পড়ে মনে হয়েছে, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় সঠিক বিষয়গুলোকে এই পত্রিকা তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, কাগজটা একটা দিশা দেখায়। বিশেষত প্রভাসবাবুর যে বক্তব্যগুলো আসে তা খুব আকৃষ্ট করে। মনে হয় আরও বহু মানুষ এই বক্তব্য পড়লে সমাজের উপকার হবে। বাজারি কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপনের ঝলক ও শাসক-বিরোধী নেতা-নেত্রীদের একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার, অসত্য ও কু-কথার প্রতিযোগিতা চলে। গণদাবীতে কিন্তু সমাজের বহুবিধ সমস্যা কোথা থেকে আসছে, কেনই বা আসছে, সেগুলোর মীমাংসার রাস্তা কী হতে পারে, তা নিয়ে একটা পথনির্দেশ থাকে।

একজন কৃষক চাষবাস নিয়েই থাকেন। তিনি নিয়মিত গ্রাহক। তাঁর বক্তব্য, আপনাদের কাগজ পড়তে ভাল লাগে বলে নিই। আসলে এই কাগজটা থেকে অনেক কিছু পাই। যে কোনও বিষয়ে গণদাবী সত্যটাকে তুলে ধরে। কাগজটি পড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনায় অংশ নিতে পারি। তর্ক-বিতর্কের মাঝে গণদাবী পড়া জ্ঞান থেকে যখন কিছু বলি তখন অনেকেই মন দিয়ে শোনে আর ভাবে, এই চাষা লোকটা এত কী করে জানলো! আবার ভাবে, এ যে যুক্তিগুলো করে তা তো ফেলে দেওয়ার নয়।

লেখার মান নিয়েও অনেকে প্রশংসা করেন। কাগজটি নিয়ে যাওয়া মাত্রই তিন টাকা বের করে দেন। কোনও সপ্তাহে কাগজ না দিলে পরের বারে খোঁজ নেন। দামের বিষয়েও অনেকেই বলেন, চার বা পাঁচ টাকা করতে বলবেন নেতাদের। তিন টাকা খুচরো দেওয়াটা বড় অসুবিধে।

এটি একটি বিপ্লবী দলের বাংলা মুখপত্র। তাই শুধুমাত্র হেডলাইন দেখে রেখে দেওয়া নয়, গণদাবীর সমস্ত খবর সবার খুঁটিয়ে পড়া দরকার।

বিদ্যুৎ সীট জগদল্লা, বাঁকুড়া

প্রভাস ঘোষের বক্তব্যের অপেক্ষায়

বরুণদা বাড়িতে আছেন নাকি— বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকতেই উত্তর এল, দাদা, গণদাবী এনেছেন? আমি হ্যাঁ বলতেই তিনি বললেন, ভেতরে আসুন, আমি নামছি। অতি দ্রুত তিন তলা থেকে নেমে এসে বললেন, এই সংখ্যায় কি প্রভাসবাবুর শহিদ মিনার ময়দানের ভাষণটা বেরিয়েছে? বললাম, এই সংখ্যায় ভাষণের কিছু কিছু অংশ রয়েছে। সম্ভবত পরের সংখ্যায় বেরোবে।

তিনি বললেন, আমি তো সভায় যেতে পারিনি, তাই অধীর আগ্রহে তাঁর বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছি। বললেন, ইতিহাসের কী পরিহাস দেখুন, এই আমিই একদিন অপেক্ষা করে থাকতাম— প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু কী বলেছেন তা জানার জন্য। আমার উপর তখন দায়িত্ব ছিল বোর্ডে গণশক্তি লাগানোর। তাই কাগজটা প্রথম আমার কাছেই আসত। পেয়েই আমি চোখ বোলাতাম নেতারা কে কী বলেছেন। সেই আমিই আজ অপেক্ষা করে থাকি, প্রভাসবাবু কী বলেছেন তা জানার জন্য! বলতে বলতে তাঁর মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

প্রবীর মণ্ডল
কলকাতা ১৩

জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের বিরোধিতা এস ইউ সি আই (সি)-র

২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে কাঁথির উপকণ্ঠে জুনপুটে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু কাঁথির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণ ও জুনপুটবাসীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণ থেকে সরে আসেনি, গোপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক জানিয়েছেন ডিআরডিও খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক কাজ শুরু করতে চলেছে কাঁথির উপকণ্ঠ জুনপুটে।

ভারতে ইতিমধ্যেই চাঁদিপুরে মিসাইল উৎক্ষেপণ ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে পাঁচ ছয় মাস অন্তর একটি মিসাইল পরীক্ষা করা হয়। এই সময়সীমা কমিয়ে আনলেই তো বাড়তি মিসাইল কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া আমেরিকা ছাড়া ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স সহ বেশিরভাগ দেশেই একটি করে মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র আছে। তাহলে ভারতের মতো একটি পিছিয়ে পড়া দেশে প্রতিরক্ষার কথা বলে ওড়িশার চাঁদিপুর, তামিলনাড়ুর শ্রীহরিকোটার পরও আবার জুনপুটে মিসাইল কেন্দ্র স্থাপনের সত্যিই কি প্রয়োজন আছে?

এলাকাবাসীর আশঙ্কা জুনপুটে একবার মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপিত হলে সমগ্র এলাকা মিলিটারির দখলে চলে আসবে। যুদ্ধ লাগলে আক্রমণকারী দেশ অন্য দেশের মিসাইল ও সেনা ঘাঁটি, পরমাণুবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে, সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ লাগলে জুনপুট আক্রমণকারী দেশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলে শুধু জুনপুট উপকূলবাসী নয়, সমগ্র কাঁথিবাসীর জীবন বিপন্ন হবে। গণপ্রতিরোধের চাপে যে হরিপুর থেকে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল, মিলিটারি দিয়ে জুনপুট সংলগ্ন সেই হরিপুরে আবার পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। সুতরাং জুনপুটে মিসাইল কেন্দ্র স্থাপন হওয়া মানে হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিশ্চিত করা, হাজার হাজার মানুষকে জীবন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করা, তেজস্ক্রিয় দূষণের দিকে সমগ্র কাঁথি মহকুমাকে ঠেলে দেওয়া। সামগ্রিক পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতায় আন্দোলনে নেমেছে স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাব কন্টাই সায়েন্স সেন্টার সহ বিভিন্ন সংগঠন। এই প্রকল্প বাতিলের দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে এসইউসিআই(সি)-র পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটি।

কেন্দ্রীয় বাজেট

দুয়ের পাতার পর

ন্যায়বিচারের একটি পদক্ষেপেরও দেখা পাওয়া গেল না। অথচ বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন, গত ১০ বছরে দেশের মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। যেন তাঁর জানা নেই যে, এই গড় আয় বৃদ্ধির আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে দেশের ধনকুবেরদের, একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের আয় বিপুল বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যেই! দেশের মানুষের সঙ্গে এই যে তাঁদের মিথ্যাচার, তা থেকেই প্রমাণ হয়, বিজেপি সরকারের 'রামরাজ্যে'র প্রতিশ্রুতির গোটাটাই আসলে ভোটের ভাঁওতা। এই 'রামরাজ্যে'র হর্তাকর্তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার তো দূরস্থান, সামান্য সততার নজিরও মেলা দুষ্কর।

জীবনাবসান

কলকাতায় এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট)-এর দমদম আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কৃষ্ণা সেন দীর্ঘ রোগভোগের পর ৮ জানুয়ারি বিকেলে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আঞ্চলিক নেতারা হাসপাতালে পৌঁছান। সেখান থেকে মরদেহ পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

কমরেড কৃষ্ণা সেন ছাত্রাবস্থায় আশুতোষ কলেজে ছাত্রসংগঠন এ আই ডি এস ও-র সঙ্গে যুক্ত হন। কলেজে পড়ার সময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্র আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী কালে তিনি মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এআইএমএসএস-এর উদ্যোগে নির্যাতিতা মহিলাদের বিনা খরচে আইনি সাহায্য করার জন্য গড়ে উঠেছিল লিগাল সার্ভিস সেন্টার। কমরেড কৃষ্ণা সেন এই সংগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আইনজীবীদের পরামর্শ বিনা খরচে পাওয়ার জন্য সাহায্য করতেন। এ ছাড়াও শিক্ষিকা হিসেবে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী ছিলেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগ্রামী সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন। পার্টির দমদম আঞ্চলিক কমিটির কাজের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেন। নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বেশ কয়েক বছর প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই অবস্থাতেও তিনি রাজ্য জুড়ে বেগম রোকেয়ার জীবন চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি কমরেডদের কাছ থেকে দলের কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন। দলের কর্মীদের প্রতি তাঁর যথার্থ ভালবাসা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠককে হারাল।

কমরেড কৃষ্ণা সেন লাল সেলাম

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্তর্গত লক্ষ্মণপুর লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড হিমাংশু মাহাতো ২২ ডিসেম্বর মাত্র ৫৯ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দু'বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর গ্রাম খৈরিপিহিড়া সহ আশপাশের এলাকা থেকে দলের কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। আশির দশকে ছাত্রাবস্থাতে তাঁর বাবা হুড়া থানার বিশিষ্ট সংগঠক ও লক্ষ্মণপুর লোকালের প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত কমরেড দশরথ মাহাতোর মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। পারিবারিক আবহই তাঁকে দলের প্রতি আকৃষ্ট করে। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিকে সফল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বহু সময় তিনি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচিগুলিতে তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে যোগদান করতেন। কমরেডদের থাকা খাওয়ার জন্য তাঁদের বাড়ির দরজা ছিল অবারিত। তাঁর সহজ মধুর ব্যবহার ছোট বড় সকলকে মুগ্ধ করত। দলের আদর্শগত চিন্তার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। পার্টির কোনও ক্ষয়ক্ষতি, কোনও কমরেডের কোনও অসুবিধা হলে তাঁর যেমন উদ্বেগের শেষ থাকত না, তেমনি পার্টির কোনও ভালো খবর, আন্দোলন-লড়াইয়ের জয়ের খবরে আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থাতেও দলের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকার মানুষ একজন উদার মনের দরদি মানুষকে হারাল। দল হারাল একজন মূল্যবোধসম্পন্ন কমরেডকে।

কমরেড হিমাংশু মাহাতো লাল সেলাম

চরম মিথ্যাচার বিজেপি-আরএসএসের

একের পাতার পর

বিপরীত।

প্রধানমন্ত্রী এবং ভাগবতরা যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চিন্তার দ্বারা চালিত হন, সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যে তার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি শুধু অসাম্প্রদায়িকই ছিলেন না, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ জাতির পক্ষে যে কত ক্ষতিকর তা তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বারবার তুলে ধরেছেন এবং কী ভাবে তা দূর করা যায় তার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টারই ফল আমরা দেখতে পাই আজাদ হিন্দ ফৌজে। সেখানে হিন্দু মুসলমান শিখ সব ভারতীয় একসঙ্গে বসে যেমন খেয়েছেন থেকেছেন তেমনই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। অন্য দিকে ভাগবতদের চিন্তাধারা সমাজে সম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে চলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ছিল আরএসএস

সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ আপসহীন নেতা। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অনুগামী সেই সংঘ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলন বলতেই রাজি হয়নি। আরএসএস-এর তাত্ত্বিক নেতা গোলওয়ালকার তাঁর বই 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'-এ মুসলমান বিদ্বেষের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। বইটির একটি মাত্র অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ শাসনের উল্লেখ রয়েছে। এই উল্লেখটির উদ্দেশ্য হল 'ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদের' তীব্র সমালোচনা করা। সেখানে তিনি বলেছেন, ''আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও সর্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতিত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু আন্দোলনই নিছক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তার নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের ওপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে।''

এই ভ্রান্ত চিন্তার ভিত্তিতে আরএসএস স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি শুধু নয়, নানা সময়ে ব্রিটিশের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আরএসএস-বিজেপির আইকন হিন্দু মহাসভার নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রথম জীবনে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করলেও অল্পদিনের মধ্যেই সে পথ ছেড়ে দেন। ১৯২০-র দশকের সমসাময়িককাল থেকে তিনি 'হিন্দুত্বের' তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধিতা ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশের কাছে মুচলেকাও দেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁর স্লোগান ছিল, 'রাজনীতির হিন্দুকরণ এবং হিন্দুধর্মের সামরিকীকরণ।' যখন সারা দেশের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়ে আন্দোলনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জীবনপণ করে লড়ছে, সেই সময় সাভারকর ১৯৪১-এ হিন্দু মহাসভার ভাগলপুর অধিবেশনে বলেছেন, ''ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে'' (*সাভারকর সমগ্র, খণ্ড ৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দুসভা প্রকাশিত, পৃঃ ৪৬০*)। তিনি ডাক দেন, ''হিন্দু বন্ধুরা আসুন, হাজারে হাজারে লাখে লাখে যোগ দিন সামরিকবাহিনীতে, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে।'' (*বিনায়ক দামোদর সাভারকরস হোয়ার্লউইন্ড প্রোপাগান্ডা— এএস ভিডে, পৃঃ ২৬*)। এই গোলামির পুরস্কার হিসাবে ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে সাভারকরের পছন্দমতো লোক মনোনীত করা হয়েছিল। তিনিও ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন (*ওই, পৃঃ ৪৫১*)। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলেন, ''আমি মনে করি না যে, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হবে।'' আরও একধাপ এগিয়ে তিনি মিত্রশক্তিকে অর্থাৎ ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার কথাও বলেছিলেন, ''এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষের জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে।'' (*রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী*)। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর একটি চিঠি সংযুক্ত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, ব্রিটিশের বিপদ তাঁদেরও বিপদ। প্রসঙ্গত, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ থেকেই জন্ম বিজেপির।

ভোটে ধর্মকে ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন নেতাজি

সংঘ কিংবা বিজেপি ভারতে যে হিন্দুরাজের কথা বলেন সুভাষচন্দ্র তাকে সম্পূর্ণ অলস চিন্তা বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। শ্রমসিক্ত জনসাধারণ যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সম্মুখীন— বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র তার কোনওটিরই সমাধান এই চিন্তার মধ্যে নেই'' (কুমিল্লার ভাষণ, ১৪ জুন ১৯৩৮)।

সেই সময়ে একদিকে সংঘ, হিন্দু মহাসভা অন্য দিকে মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে তিনি এতই বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির কোনও সদস্য কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটির সদস্য হতে পারবে না বলে দলীয় সংবিধানে নতুন ধারা যুক্ত করেছিলেন। আরএসএস-বিজেপির রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পুরোপুরি সংখ্যালঘু বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের লক্ষ্য মুসলিম বিদ্বেষকে উস্কে তুলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি। তার জন্যই বাবরি মসজিদ ধ্বংস, তার জন্যই মহা সমারোহে রামমন্দির তৈরি। অন্য দিকে নেতাজির বক্তব্য ছিল, ''ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের বিষয় হওয়া উচিত, ব্যক্তি হিসেবে মানুষ যে ধর্ম পছন্দ করে তাহা অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি দ্বারা''— *২২ জুন, ১৯৩৯, বোম্বাইতে ফরওয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে ভাষণ*।

> **''সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোটভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না।''**

আরএসএস-বিজেপির এই জঘন্য ভূমিকা দেখেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, ''সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশূল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোটভিক্ষায় পাঠিয়েছে। ত্রিশূল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দুমাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। এই বিশ্বাসঘাতকদের আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সরিয়ে দিন। তাদের কথা কেউ শুনবেন না।'' (*১৯৪০ ঝাড়গ্রামের ভাষণ*)

শিক্ষা বা শ্রম কোনও নীতিতেই বিজেপি নেতাজির পথ অনুসরণ করে না

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর সরকার নেতাজিকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার জন্য সব রকম পদক্ষেপ করেছে। কোনও ব্যক্তি বা মনীষীকে সম্মান দেওয়ার যথার্থ এবং একমাত্র উপায় হল তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা। সেই কাজটি বাদ দিয়ে শুধু মূর্তি প্রতিষ্ঠা, তাঁর নামে পুরস্কার ঘোষণা, মিউজিয়াম তৈরি সব কিছুই বাস্তবে লোকদেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের শ্রমিক-কৃষকদের সম্পর্কে নেতাজির চিন্তার সঙ্গে মোদি সরকারের নীতির কি কোনও মিল আছে?

নেতাজি বলেছিলেন, ''আজ ভারতের শ্রমিকগণ যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি কামনা করেন তাহা হইল ঐক্য। তাহারা যেমন দুর্বল ও নিরক্ষর তাহাতে ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যই তাহাদের একমাত্র অস্ত্র। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সর্বত্রই চলিতেছে। ইহা সহজও বটে। কেন না ভারতের জনগণ ভুখা অবস্থায় আছেন। ধনিক শ্রেণির হাতে প্রচুর টাকা থাকায় তাহারা যে কোনও উদ্দেশ্যে তাহা কাজে লাগাইতে পারেন। শ্রমিকদের মনে রাখা উচিত যে, যাহারা গণ্ডগোল ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে চায় তাহারা তাহাদের শত্রু এবং তাহারা ধনিক শ্রেণির দালাল হিসাবে কাজ করে''— (*জগদ্দল চটকল শ্রমিক সম্মেলনে ভাষণ, ১০ অক্টোবর, ১৯৩১*)। নরেন্দ্র মোদিরা তাঁদের শাসনে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙার জঘন্য কাজটাই করে চলেছেন। একদিকে শ্রমআইন বদলে দিয়ে মালিকদের অবাধে শ্রমিক শোষণের অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের ঐক্যকেই দুর্বল করে দিচ্ছেন। কেউ বিশ্বাস করবে, নেতাজিকে প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে বিজেপি!

নেতাজি চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে চলবে। বলেছিলেন, ''ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আর এক দিক দিয়া উপযোগিতা রহিয়াছে— ইহা অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিতে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক চেতনার প্রভাব গোঁড়ামির মৃত্যু ঘোষণা করে। একটা মুসলমান কৃষকের সহিত মুসলমান জমিদারের যে মিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি মিল রহিয়াছে একটি হিন্দু কৃষকের সহিত একটি মুসলমান কৃষকের। জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহাদের শিখাইতে হইবে এবং একবার তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহারা কখনও সাম্প্রদায়িক বিরোধে দাবার ছক হইতে সম্মত হইবে না'' (*পুনায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণ, ৩ মে, ১৯২৮*)। নেতাজির আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীরা যে জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করেছেন তা যেমন ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বিরোধী, তেমনই বিজ্ঞানবিরোধী। তা হলে কোথায় তাঁরা নেতাজির আদর্শকে অনুসরণ করছেন? বাস্তবে ধরে ধরে দেখানো যায়, কৃষিসমস্যা, নারীসমস্যা, শিল্পনীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সহ প্রতিটি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির নীতি নেতাজির চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে নেতাজি সংক্রান্ত সমস্ত গোপন ফাইল প্রকাশ করবেন। বাস্তবে একবারই কয়েকটি মামুলি ফাইল প্রকাশ করা ছাড়া নরেন্দ্র মোদি সরকার ফাইলগুলি নিয়ে নীরবতাই পালন করে চলেছেন। নেতাজির অন্তর্ধানের পর আশি বছর পার হয়ে গেছে। কংগ্রেস এবং ব্রিটিশের যোগসাজশে সেদিন নেতাজির বিরুদ্ধে এমন কী মারাত্মক ভূমিকা পালিত হয়েছিল যে এমনকি বিজেপিও সেই সব ফাইল প্রকাশ্যে আনতে ভয় পাচ্ছে। দেশের মানুষের তো অধিকার রয়েছে তাঁদের প্রিয় নেতার সঙ্গে ব্রিটিশ এবং কংগ্রেস কী ব্যবহার করেছিল তা জানার। তা গোপন করা কি নেতাজিকে সম্মান দেওয়া? দেশের সাধারণ মানুষ, কংগ্রেস কিংবা বিজেপির কাছে যাঁদের টিকি বাঁধা নেই, তাঁরা অন্তত তা মনে করেন না।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে ইতিহাস বিভাগ আজাদ হিন্দ বাহিনী ও নেতাজির স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য সংবলিত একটি বই তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিল প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে একদল ইতিহাসবিদকে। সেই বই আলোর মুখ দেখেনি। ২০১১ সালে দিল্লি হাইকোর্ট বইটি প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার সেই নির্দেশ মানেনি। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর নানা মহল থেকে বইটি প্রকাশের দাবি জানানো হয়। মোদিও তা প্রকাশ্যে আনলেন না। নেতাজি প্রশ্নে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বিজেপি সরকারের কোনও পার্থক্যই দেশের মানুষ পায়নি।

ভোট-রাজনীতির স্বার্থেই নেতাজি-বন্দনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-মোহন ভাগবত তথা বিজেপি-আরএসএসের চিন্তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

দিল্লিতে শিক্ষা সম্মেলনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা

বিকল্প শিক্ষানীতি তৈরির সিদ্ধান্ত

৩ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে দিল্লির গালিব অডিটোরিয়ামে বিজেপি সরকারের চরম জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং

একটি বিকল্প জনমুখী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০০-র বেশি শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক ও শিক্ষাকর্মী।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নবতিপর অধ্যাপক ইরফান হাবিব অসুস্থ থাকায় অনলাইনে সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক দেশেরই নিজের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন, ভারতের ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন ভারতের অতীতকালের একটি বিকৃত চিত্র উপহার দিয়েছে। ভারতের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানধারা নামে যা তারা করেছে, তা মনুস্মৃতি ভিত্তিক। তিনি বলেন, জ্ঞানের কোনও জাতীয় সীমানা থাকতে পারে না। বিজেপি সরকার ইতিহাসের পুনর্গঠন করছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ফুরকান কামার বলেন, স্বচ্ছতার অভাব এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এই শিক্ষানীতির বড় সমস্যা। দিল্লির জেএনইউ-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, এই শিক্ষানীতি নিপীড়িত শ্রেণির মানুষকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। সরকার শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব থেকে সরে আসতে চাইছে। প্রাক্তন উপাচার্য সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, একটা বিশেষ মতাদর্শকে ভিত্তি করে তৈরি এই শিক্ষানীতি ইতিহাসকে বদলে দিচ্ছে। ডারউইন তত্ত্ব ও পর্যায় সারণীর মতো পরীক্ষিত বিজ্ঞানের তত্ত্বকে বাতিল করছে।

প্রাক্তন উপাচার্য এল জহর নেশান শিক্ষা সহ মানুষের চিন্তাধারা, অভ্যাস, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে একটা ছাঁচে ঢালার চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর কথায়, মহাকাব্যকে ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা চলে না। অথচ ঠিক সেই কাজটাই গত ২২ জানুয়ারি সরকারি উদ্যোগে করা হল। ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্বেগ— ‘একটি জাতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হারালে সে দেশে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকে না। মন্ত্রীরা দাবি করছেন এ দেশই গণতন্ত্রের জন্মদাত্রী। অথচ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সূচকে এ দেশ বিশ্বে পিছনের সারিতে। কেবল ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রভিত্তিক শিক্ষাকে মূল্যবোধযুক্ত শিক্ষা হিসাবে তুলে ধরে এই শিক্ষানীতি ছাত্র-যুবদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করছে। বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ এই শিক্ষানীতির সবথেকে বিপজ্জনক দিক’।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বিপজ্জনক জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা তুলে ধরেন। এই আন্দোলনের চাপে কর্ণাটক সরকার ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রত্যাহার করে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করছে। তিনি বলেন, সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটি দেশজুড়ে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-পড়ুয়াদের মতামতের ভিত্তিতে জনমুখী, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়ন করছে। আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিকল্প শিক্ষানীতি কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা হবে। সম্মেলনের সভাপতি গুজরাট সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রকাশ এন শাহ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হত ‘সারেন্ডার নট’। আমাদের আন্দোলনও তেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সঞ্চালনা করেন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজাশেখর।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স, উচ্চশিক্ষা ও স্কুলশিক্ষা নিয়ে তিনটি ‘প্যানেল ডিসকাসন’ হয়। এই অধিবেশন সঞ্চালনা করেন সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমল সাঁই।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রকাশ এন শাহ। সম্পাদক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং কয়েকজন প্রতিনিধি তার উপর আলোচনা করেন। সবশেষে প্রকাশ এন শাহকে সভাপতি ও অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্করকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও ফলপ্রকাশের দাবিতে

ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনে এআইডিএসও

ঝাড়খণ্ডের চাইবাসায় কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের ঘাটতি দূর করা, ২০১৭-র বকেয়া দ্বিতীয় জেনেরিক পেপারের জন্য বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া, সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশ নিয়মিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির ক্যালেন্ডার ধর্মীয় আধারে সাজানোর প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও তাঁর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠন দাবি জানিয়েছে, বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা চলবে না।

বরাদ্দ ছাঁটাই ঃ প্রতিবাদ মিড-ডে মিল কর্মীদের

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বাজেটে মিড-ডে মিল প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি বাজেটের দিনেই কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখায় সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। লেনিন মূর্তির সামনে পথ অবরোধ করে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই শোষিত বঞ্চিত কর্মীরা মিড-ডে মিলে খাবারের মান বৃদ্ধি, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি, ভাতা প্রদান, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও বছরে ১২ মাসের বেতনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা বলেন, আমরা আশা করেছিলাম এবারের বাজেটে হয়তো আমাদের দাবি মেনে কিছুটা বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। বাস্তবে দেখা গেল বৃদ্ধির পরিবর্তে এই খাতে বরাদ্দ ৩৯৪ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। বিক্ষোভ শেষে কর্মীরা মিছিল করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত যান এবং সরকারি বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের শপথ নেন।

চরম মিথ্যাচার বিজেপি-আরএসএসের

সাতের পাতার পর

চিন্তাধারার মিল কোনও দিক থেকেই নেই। তা হলে সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে তারা মানেন, এ কথা বলছেন কেন? এর মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তা হল, একদিকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের কলঙ্কজনক ভূমিকাটিকে আড়াল করা, অন্য দিকে জাত ধর্ম প্রদেশ নির্বিশেষে সুভাষচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং ধর্মনিরপেক্ষ, আপসহীন জাতীয় নেতা হিসাবে দেশজোড়া তাঁর যে গ্রহণযোগ্যতা তাকে আত্মসাৎ করা। তাঁদের আদর্শের সঙ্গে নেতাজির চিন্তা যে বিপরীত মেরুতে, তা গোপন করে তাঁরা আজ সুভাষপ্রেমী সাজছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএস এবং বিজেপির পূর্বসূরী তৎকালীন হিন্দু মহাসভার কলঙ্কজনক ইতিহাস নতুন প্রজন্ম জানেই না, আর প্রবীণরা চর্চার অভাবে বিস্মৃত। সেই ভূমিকাকে নেতাজি-প্রীতি দেখিয়ে মানুষের মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টাও এই নেতাজি-বন্দনার অন্যতম কারণ। আজ যখন দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবায় নিবেদিত বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা— মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, বেসরকারিকরণ, মহিলাদের উপর অত্যাচার, শিক্ষা-চিকিৎসার বেসরকারিকরণ প্রভৃতি প্রতিটি প্রশ্নে প্রকট হয়ে উঠছে, তখন ‘নেতাজির আদর্শ আমাদের আদর্শ’ এই কথা বলার দ্বারা দেশের মানুষের নেতাজির প্রতি আবেগকে কাজে লাগিয়ে সরকারের জনবিরোধী ভূমিকাটিকে আড়াল করার হীন চেষ্টাই রয়েছে এর মধ্যে। ফলে প্রধানমন্ত্রী ও ভাগবতের নেতাজি-বন্দনা যে নিছক ভোট-রাজনীতির হিসাব কষে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com